২৬/১০/২০০৩

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... পৃষ্ঠা 6 কলাম 7

# শিক্ষাক্রম ঃ জিয়ান-কাঠ ও মরণ-কাঠি

নায়ীম উদ্দিন আহ্‌মেদ

ংলাদেশের স্কুল কারিকুলাম প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের কি নির্দেশনামূলক এ লেখাটি দেখে কেউ যেন হঠাৎ মনে না করে বসেন যে, শিক্ষাক্রম সম্পর্কীয় বিদ্যেয় আমি দিগ্‌গজ। আসলে, কারিকুলাম বা শিক্ষাক্রম প্রণয়ন এ লেখার উদ্দেশ্য নয়। এ জন্য তো এন-সি-টি-বি রয়েছেই জাতীয় পর্যায়ে। তবে যেহেতু কারিকুলাম একটি সদা চলমান প্রক্রিয়া এবং য়েই 'আরো ভাল' করার অবকাশ থাকে, সেই দৃষ্টিকোণ থেকে আমার কিছু ভাবনাকে এখানে তুলে ধরলাম। আমি টি এখানে বলতে চেয়েছি তা হল, কোন্ নীতিমালার ভিত্তিতে কারিকুলাম্ তৈরী হবে এবং আমার সবিনয় পরামর্শ তাঁদের প্রতি, যাঁরা কারিকুলাম বাস্তবায়ন করার কাজে সংশ্লিষ্ট রয়েছেন ও সেই বাস্তবায়নকালে কোথায় কোথায় ক সজাগ থাকতে হবে।

ই বলা হয়তো খুব একটা অন্যায় হবে না যদি বলা হয়, আমাদের দেশে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই কাজ হয় Intuition-ত্তিতে, গবেষণার মাধ্যমে নয়। তাই তাৎক্ষণিকভাবে সেগুলো হতে কিছুটা ফল পাওয়া গেলেও জাতীয় জীবনে র কোনো সুদূরপ্রসারী সুফল লক্ষ্য করা যায় না। কারিকুলাম সম্পর্কীয় কার্যক্রমে Intuition-এর পরিবর্তে র মাধ্যমে আরো Refined Way-তে কাজ করলে অবশ্যই ইতিবাচক ফল। এই গবেষণার দুয়ার জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড ছাড়াও অন্য প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির জন্য উন্মুক্ত থাকা বাঞ্ছনীয়। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এ ব্যাপারে সেল্ গঠন করতে পারেন। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন যেমন পিএইচডি করতে দেন, তেমনি কারিকুলাম্-এর জন্যও ব্যবস্থা নিতে পারেন। মোট কথা, বিভিন্নভাবে এই গবেষণা কর্ম পরিচালিত হতে পারে। তবে এন-সি-টি-বি যেহেতু ারে শীর্ষ প্রতিষ্ঠান, তাই তার দায়িত্ব যেমন অপেক্ষাকৃত বেশী তেমনি তার ভাবনাগুলোও নিশ্চয়ই গভীর ও ব্যাপক। কানো প্রতিষ্ঠান কারিকুলাম সম্পর্কীয় গবেষণা চালাতে গেলে দেখতে হবে সেখানে গবেষণার পরিবেশ আছে কিনা, পরিচালনাকারীর মেধা আছে কিনা এবং গবেষণার জন্য তার মন-মানসিকতা কেমন। এগুলো জানা খুবই দরকার। -জর্জরিত আমাদের এই ছোট্ট দেশটিতে কতটুকু সম্পদ আছে তার সঠিক পরিমাপ দুরূহ। হয়তো অনেক আছে কিংবা কটা বেশী নেই। আবার যা-ওবা আছে তার বেশীর ভাগই রয়ে গেছে অনাবিষ্কৃত, আধুনিক প্রযুক্তি ও দক্ষ জনশক্তির। তবে আমরা গভীরভাবে বিশ্বাস করি, অসীম সম্ভাবনাময় এদেশ। তাই আশার আলো আছে বৈকি! এই যে আমাদের ত মানুষ, এদেরকে যদি উন্নয়নের মাধ্যমে মানবসম্পদে পরিণত করা যেত, তাহলে কি যে হতে পারতো, বলা মুশকিল। ম্ভব এবং একমাত্র শিক্ষার মাধ্যমেই তা সম্ভব। কিন্তু কোন ধরনের সে শিক্ষা? এটি সেই ধরনের শিক্ষা যা জ্ঞান অর্জনে হবে, মূল্যবোধের উজ্জীবন ঘটাবে, আর কর্ম ও অন্নের সংস্থান দেবে। কিন্তু আমাদের বাস্তব অবস্থাটা কি? এ যেন লক্ষ্য থেকে সহস্র আলোকবর্ষ দূরে। যেসব ছেলে-মেয়ে ইদানীং স্কুল-কলেজ থেকে বেরুচ্ছে, তাদের মধ্যে মূল্যবোধের প্রতিফলন নেই। একটা নামকরা কলেজের পাস দিয়ে যত দ্রুত চলে যাওয়া যায়, ততই মঙ্গল। স্রষ্টা আমাদেরকে কান ও মুখ দিয়েছেন নিশ্চয়ই ভাল জিনিস দেখার, শুনার ও বলার জন্য। কিন্তু এর বিপরীতটাই তো ঘটছে অহরহ। র প্রতি শ্রদ্ধাহীনতা তো বলতে গেলে একটা ফ্যাশনে দাঁড়িয়ে গেছে। প্রাপ্ত শিক্ষা তাদেরকে Self-learning-এর তাহীনই শুধু করছে না, বরং অনেক ক্ষেত্রে এ শিক্ষা Counter productive হয়ে আঘাত হানছে সমাজের বুকে। কর জন্য শিক্ষিত লোক স্ত্রীর গায়ে হাতই শুধু তুলছে না, তাকে হত্যা পর্যন্ত করছে। যেকোন প্রসন্ন সকালে জাতীয় গুলোয় চোখ বোলালে একথার সত্যতা মিলবে। এহেন পটভূমিতে দাঁড়িয়ে গভীর বেদনার সঙ্গে আমরা লক্ষ্য তাহলে গলদ্‌টা কোথায়? কোথায় এর উৎসস্থল? কেন হচ্ছে? আমরা বিভিন্ন শিক্ষা কমিশন, কমিটি ও টাস্ক র রিপোর্ট এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সংবিধানের সম্পর্কীয় সংশ্লিষ্ট অংশ নিবিড় কৌতূহল ও গভীর শ্রদ্ধার পড়েছি। সেসব রিপোর্ট সর্বজনশ্রদ্ধেয় ব্যক্তিবর্গের ত প্রজ্ঞা দিয়ে গড়া। উদ্দেশ্যাবলী চমৎকার Concept রও সেগুলো তুলনাবিহীন। শুধু পড়াই নয়, এদেশের ত জনগোষ্ঠীর প্রাত্যহিক আচরণও আমরা অখণ্ড যোগ দিয়ে পর্যবেক্ষণ করেছি। এই যে যুগপৎ পড়া ও এর মাধ্যমে আমাদের বদ্ধমূল ধারণা হয়েছে যে, একটি বা ছাত্রীর (pupil) শৈশব বা কৈশোরকালীন যেসব উন্মেষ, জাগরণ, বিকাশ ও প্রতিষ্ঠা প্রয়োজন সেগুলো মুটি হচ্ছেঃ

দশপ্রেম ও জাত্যাভিমান ● জাতীয় সংহতি ও আঞ্চলিক তা ● জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ ● ক ও সামাজিক মূল্যবোধ ● নারীজাতির প্রতি শ্রদ্ধা; শিক্ষার গুরুত্ব অনুধাবন; ও নারীর ক্ষমতায়ন ● অন্য র প্রতি দরদ ● শ্রমের মর্যাদা ● আত্মসম্মানবোধ ● পরিবেশ সংরক্ষণ ● জনাধিক্য সচেতনতা ● সহিষ্ণুতা, রিকতা ও দায়িত্ববোধ ● অন্যের মেধাবিকাশে সহায়তা ● অশিক্ষার অভিশাপ অনুধাবন ● বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ ● বাস্তব তর মোকাবেলা ● সাম্প্রতিক বিশ্বের বিজ্ঞান- প্রযুক্তির ধারণা।

র যে ক্ষেত্রগুলো নিরূপিত হল, সেগুলো বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষার উদ্দেশ্যাবলীতে অন্তর্ভুক্তির বিনম্র দাবীদার। এবং দের দৃঢ় বিশ্বাস, এসব গুণের বীজ যদি ছাত্রের শৈশব অথবা কৈশোরে বপন করা যায়, তবে তা পরবর্তীতে তার জীবনে প্রতিফলিত হবেই এবং জাতি তার কাঙ্ক্ষিত ফললাভ করবে। আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে, কারিকুলামে সব। সেই মুখ্য। অন্য সব উৎপাদনই থাকবে : পাঠ্যপুস্তক থাকবে, সিলেবাস থাকবে, শিক্ষক থাকবে, প্রাতিষ্ঠানিক স্থাপনা থাকবে, মূল্যায়ন থাকবে। কিন্তু এসব কার জন্য? সবই তো সেই ছাত্রের জন্য। সেই হচ্ছে সবকিছুর কেন্দ্রবিন্দু। ট নবজাতকের কাছে তার মাতা-পিতার একটিই প্রত্যাশা থাকে, শিশুটি যেন এ ধরণীকে বাসযোগ্য হিসেবেই পায় তার ্যৎ জীবনে। এবং এই 'বাসযোগ্য' করার প্রয়োজনে তার কৈশোরকালীন কুসুম কোমল হৃদয়ে ছোটদের প্রতি স্নেহ-মায়া-বাসা; সমবয়সীদের প্রতি সহযোগিতা-সহমর্মিতা; এবং বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মানের লালনসহ কিছু সুন্দর গুণ বাসা বাঁধতে পারে। কিন্তু কীভাবে তা সম্ভব? বিদ্যালয় জীবনের সোনালী দিনগুলোয় OSMOSIS-রূপী প্রতিনিয়ত শিক্ষক মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে বিরল এই গুণগুলো তার নরোম মনে দানা বাঁধে। পরবর্তীতে সেই ছোট্ট ছেলেটি একদিন ত মানুষ হিসেবেই সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। তবে এই প্রক্রিয়া শুধু কঠিনই নয়, প্রচন্ড কঠিন। ভাল শিক্ষকের অর্থাৎ ar Solution ছাত্রের মাঝে অর্থাৎ স্বচ্ছ পানির মধ্যে একটু একটু করে প্রতিনিয়ত সঞ্চারিত হবে এবং এর ফলে ট অম্লান বিরল গুণের অধিকারী হতে পারবে। পক্ষান্তরে, শিক্ষক যদি দুর্ভাগ্যবশত খারাপ হন, তাহলে তার দোষগুলোও

শিক্ষা হবে নিরক্ষরতা দূরীকরণের হাতিয়ার এবং একে দেখতে হবে বেঁচে থাকার ন্যূনতম শর্ত হিসেবে। মাধ্যমিক পর্যা হচ্ছে স্বয়ম্ভরতা এবং কর্মজগতে প্রবেশের জন্য প্রস্তুতিমূলক পর্ব। তবে উচ্চশিক্ষা সম্পর্কে আমাদের বিশেষ একটু বক্ত আছে। উচ্চশিক্ষা সবার তরে নয় এবং অবশ্যই এ শিক্ষাকে মূল্যবোধসম্পন্ন হতে হবে। মূল্যবোধের অবর্তমানে এ-শি 'বুমেরাং' হতে বাধ্য এবং এর ভূরি-ভূরি উদাহরণ সকালের খবরের কাগজে শিক্ষিত শ্রেণীর কার্যাবলীতে পাওয়া যাবে আমাদের সমাজে বিভিন্ন পেশাজীবী যেমন চিকিৎসক, শিক্ষক, প্রকৌশলী সম্পর্কে যত্রতত্র এবং অহরহ অবজ্ঞাসূচকই নয়, মাঝে-মাঝে দারুণ ঘৃণাব্যঞ্জক মন্তব্যও যে করা হয়ে থাকে, সে সম্পর্কে কমবেশী সবাই অবগত আছেন।

ওপরে আমরা জাতীয় শিক্ষার উদ্দেশ্যাবলীর বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের যে কথা বললাম, সেগুলোর বাস্তবায়ন সম্ভব কীভাবে? নিশ্চ এজন্য একটা কার্যসাধন-পদ্ধতি দরকার, যে Mechanism-এর মাধ্যমে ছাত্রের মাঝে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাবে এই যে Mechanism, যেটিকে গোটা শিক্ষা ব্যবস্থার জীয়নকাঠি-মরণকাঠি বলে মনে করা হয়- যে শব্দটিকে প্রাচ রোমানগণ তাদের Chariot-Race এর কোর্স হিসেবে সৃষ্টি করেছিল এবং যে শব্দটি পরবর্তীকালে বিদগ্ধ শিক্ষককুল কর্তৃ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোর্স অভ্ স্টাডিজ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে- সেই শিক্ষাক্রম কারিকুলাম্ নিয়েই আমাদের যত মাথাব্যথা। সমস্যা এখানে একটু বেশীই এজন্য যেহেতু এই কারিকুলাম্-এর বেশীর ভাগই Abstract, নির্বস্তুক বা অমূর্ত ধরনের এবং প্রকৃতি অতি ব্যাপক। তাই এর প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন চাট্টিখানি কথা নয়।

সবাইয়ের প্রতি শ্রদ্ধা রেখেই একটি কথা বলতে চাই, কারিকুলাম্ সম্পর্কে আমাদের অনেকেরই ধারণা খুব একটা স্পষ্ট স্বচ্ছ নয়। কারিকুলাম্ বলতে আমরা অনেকেই বুঝে থাকি টেক্সটবুক ও সিলেবাস। কিন্তু ব্যাপারটা আদৌ তা ন কারিকুলাম্-এর প্রকৃতি ও পরিধি বিশাল ও গভীর; এর প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন প্রক্রিয়াও খুব জটিল। সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার ছত্রচ্ছায় একটি বিদ্যানিকেতনের ছাত্র-শিক্ষক যা যা করে থাকে (তা সে যতই খুঁটি-নাটি হোক না কেন) তাই শিক্ষাক্রমের অঙ্গীভূ একটি ছাত্র অন্য একটি ছাত্রের সঙ্গে যা কিছু করে, একদল ছাত্র অন্য আরেক দল ছাত্রের সঙ্গে যেগুলো করে, একজন শি একটি ছাত্রের সঙ্গে যা কিছু করেন, একটি ছাত্র একজন শিক্ষকের সঙ্গে যা কিছু করে এসব কিছুই কিন্তু ছাত্রের মাঝে গ ও নিবিড়ভাবে দাগ কাটে। কাজেই যেকোন জিনিস- এমনকি ছাত্র যে বেঞ্চটিতে বসবে সেটা মোছার জন্য যদি ডাস্টা প্রয়োজন থাকে- তবে সেটিও কারিকুলাম্-এর অঙ্গ। বিদ্যালয়ের ফুলবাগানটিও কারিকুলাম্-এর অংশ। স্কুল চলাকালীন ৮ ঘন্টার মধ্যে ছাত্রকে যতি প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে হয় তবে সেটিও হবে শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভুক্ত। শিক্ষক যা কর সেটি যেমন শিক্ষাক্রমের অঙ্গ, ছাত্রও যা করবে সেটিও হবে কারিকুলাম্-এর অঙ্গ। আসলেঃ Curriculum is a co prehensive term including everything that the students and their teachers do under t Purview of some managerial guidance. তবে আমরা মনে করি, স্টেজ-ওয়ারি বিষয় চিহ্নিতকরণ; পাঠ্য পাঠ্যপুস্তক; প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা; শিক্ষক; মূল্যায়ন- এগুলোই হচ্ছে কারিকুলাম্-এর প্রধান প্রধান জয়েন্ট। এগু শক্তিশালীকরণ এবং এসবের সঙ্গে জড়িত প্রতিটি মানুষকেই তার নিজের-নিজের দয়িত্ব সম্পর্কে সজাগ থাকতে হবে। জয়েন্টগুলো একটির সঙ্গে আরেকটি দৃঢ়ভাবে সংযুক্ত এবং এখানের কোনো একটি পর্যায়ে যেকোনো দুর্বলতা বা অনবধা গোটা উদ্দেশ্যকেই ব্যর্থ করে দেবে।

আমরা গভীরভাবে বিশ্বাস করি, অসীম সম্ভাবনাময় এদেশ। তাই আশার আলো আছে বৈকি! এই যে আমাদের অগুণতি মানুষ, এদেরকে যদি উন্নয়নের মাধ্যমে মানবসম্পদে পরিণত করা যেত, তাহলে কি যে হতে পারতো, বলা মুশকিল। এটি সম্ভব এবং একমাত্র শিক্ষার মাধ্যমেই তা সম্ভব। কিন্তু কোন ধরনের সে শিক্ষা? এটি সেই ধরনের শিক্ষা যা জ্ঞান অর্জনে সহায়ক হবে, মূল্যবোধের উজ্জীবন ঘটাবে, আর কর্ম ও অন্নের সংস্থান দেবে। কিন্তু আমাদের বাস্তব অবস্থাটা কি? এ যেন অভীষ্ট লক্ষ্য থেকে সহস্র আলোকবর্ষ দূরে। যেসব ছেলে-মেয়ে ইদানীং স্কুল-কলেজ থেকে বেরুচ্ছে, তাদের মধ্যে মূল্যবোধের কোনই প্রতিফলন নেই। একটা নামকরা কলেজের পাস দিয়ে যত দ্রুত চলে যাওয়া যায়, ততই মঙ্গল। স্রষ্টা আমাদেরকে চোখ, কান ও মুখ দিয়েছেন নিশ্চয়ই ভাল জিনিস দেখার, শুনার ও বলার জন্য। কিন্তু এর বিপরীতটাই তো ঘটছে অহরহ।

আজকের দিনে গবেষণা ও সার্বক্ষণিক চিন্তা-ভাবনা ব বের করতে হবে কারিকুলাম্-এ কোন্ স্টেজে বিষয়গুলো থাকবে এবং কোন্‌টি বাদ দিতে হবে। এ স্টেজের বিষয়ের কী পরিমাণ weightage থাকবে। শ্রেণীর বাংলা বইতে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'নতুন এবং সপ্তম শ্রেণীর বাংলা বইতে দ্বিজেন্দ্রলাল রা কবিতা 'নন্দলাল'। একটু খটকা লাগলো, কেননা দশকেরও আগে আমরা যখন স্কুল ফাইনাল দিয়েছি তখন এ গদ্যাংশ ও কবিতাটি আমাদের নবম- শ্রেণীতে পাঠ্য ছিল। স্বভাবতই মনে হল, ক্লাস সি সেভেন-এ এ দুটির অন্তর্ভুক্তি কি গবেষণার মা হয়েছে? হয়ত অনেকেই বলবেন, এ দুটিতে হা খোরাক আছে, তাই যে কোন শ্রেণীতেই এ ধরনের দেয়া যেতে পারে। লেখা দুটি হাসির হলেও চিন্তা দেখা দরকার, কোন্ পর্যায়ের ছেলে-মেয়ে কি ধর হাসি হজম করতে পারবে। তৃতীয় ও পঞ্চম শ্রেণীর ব বই দুটিতে যথাক্রমে জসীমউদ্‌দীন-এর 'রাখাল ছেলে রবি ঠাকুরের 'বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর' রয়েছে। স কবিতা দুটি যদি উল্লিখিত শ্রেণীদ্বয়ের মাঝে 'ইন্টারচেঞ্জ' করে দেয়া হত, তাহলে কি কোনো অসুবিধা ছিল? ধরনের চিন্তা করে এটি করা হয়নি, জানতে ইচ্ছে করে। প্রথম-দ্বিতীয়-তৃতীয় প্রভৃতি শ্রেণীর বাংলা বই 'আমার এর প্রথমাংশে জাতীয় সঙ্গীত ও জাতীয় পতাকার অন্তর্ভুক্তি নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। কিন্তু পতাকার নিচে প নির্মাণের নিয়মাবলীতে যে কঠিন অনুপাত দেয়া হয়েছে, সেগুলো দেখে ৫-৬ বছরের কোমলমতি শিশুরা ঘ যেতে পারে কিনা, ভেবে দেখা দরকার। পতাকার মাপসহ পতাকা উচ্চতর শ্রেণীতে দেয়া, সম্ভবত ভাল। শি বইতে গৌরবোজ্জ্বল জাতীয় পতাকা অবশ্যই থাকবে, কিন্তু পতাকার নির্মাণ-নিয়মাবলীর জটিল অনুপাত ও সূক্ষ্ম ওরা বিভ্রান্ত হবে কিনা সে বিষয়ে চিন্তার প্রয়োজন আছে। পাঠ্যপুস্তক বা টেক্সটবুক ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে আ অর্থেই দারুণ এক ব্যাপার। এটি বছরের শুরুতে তাদের জন্য প্রচন্ড এক আবেগ নিয়ে আসে। ছোটবেলায় ত পাঠ্যপুস্তকের জন্য অধীর আগ্রহে দিন গুণতাম এবং পাওয়ার পর সেগুলোকে গভীর আগ্রহভরে দেখতাম, করতাম, বইগুলোর নতুন পাতার গন্ধ পাওয়ার জন্য নতুন টাকার মত সেগুলোকে নাকের কাছে ধরতাম বার আমরা সঙ্গত কারণেই আশা করবো, আমাদের সন্তানদের টেক্সটবুক হবে আরো সুন্দর, আরো উন্নত মানের, ও প্রযুক্তির এহেন উৎকর্ষের যুগে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্যি, আমাদের ছেলে-মেয়েরা বছরের প্রথম তীর্থের কাকের মত হা করে থাকলেও তাদের প্রত্যাশা পূরণ হয় না, মনে হয় যেন এটি হবার নয়। বেশ ক মাস পার করে যখন সেগুলো তাদের হাতে আসে, ততদিনে তারা অনেক মিইয়ে গেছে, অনেক ক্লান্ত হয়ে প অভিভাবকরাও সেগুলো যখন হাতে নেন, তাদের মুখেও অনেক সময় হাসি দেখি না। কেন যে দেখি ন আমাদেরকে তলিয়ে দেখতে হবে। কোনো কোনো শ্রেণীর বই আবার বিভিন্ন ধরনের ভুলের বাইরে অভিভাবকগণ অবশ্য এসব ব্যাপারে মুখ খোলেন না, সম্ভবত একথা ভেবে যে, এসব পাঠ্যবই অনেক বড় বড়